জিন্না

স্বপন মুখোপাধ্যায়

গ্রন্থতীর্থ
প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা
৬৫/৩এ, কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা — ৭০০ ০৭৩

নিবেদন

আধুনিক ভারতের ইতিহাসে সব থেকে বিতর্কিত ব্যক্তিত্ব মহম্মদ আলি জিন্না। ভারতবর্ষের বহু মানুষ এই নামটি শোনামাত্র ঘৃণায় এবং ক্ষোভে তাঁকে ধিক্কার দিতে থাকেন। বিশেষ করে বাংলা এবং পাঞ্জাবের স্বজনহারা এবং বাস্তুহারা বহু মানুষ কোনোদিন বোধহয় জিন্নাকে ক্ষমা করতে পারবেন না। আবার যে জিন্না পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর মাত্র এক বছর বেঁচে ছিলেন এবং যাঁকে সে সময়েও রোগশয্যাতেই কাটাতে হয়েছে সেই জিন্নার নামটিকেই পাকিস্তানের অধিকাংশ মানুষ পুজো করেন। তাঁদের মধ্যে অনেকে এমনও মনে করেন যে জিন্না ভারতের মুসলমানদের বারোশো বছরের স্বপ্নকে সফল করেছেন।

জিন্নার জীবন ও কর্মধারার নিরপেক্ষ বিশ্লেষণের পথে দুর্ভাগ্যজনকভাবে অনেক সময় ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে শত্রুভাবাপন্ন মনোভাব অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। জিন্না নিজে তাঁর ব্যক্তিজীবন সম্পর্কে কিছু লিখে রেখে জাননি, এমনকি নিজের সম্পর্কে কিছু বলার ক্ষেত্রে তাঁর ভীষণ অনীহা ছিল। নিজের নামের আগে কোনো আলংকারিক পদবিতেও তাঁর আপত্তি ছিল। তিনি নিজেকে শুধু জিন্না বলেই পরিচয় দিতে চাইতেন। তাই ভারতবর্ষের এক জটিল রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্তের মধ্যে ব্যক্তি জিন্না হারিয়ে গিয়েছেন। যে রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দুতে স্থাপন করে জিন্নাকে বিশ্লেষণ করা হয় সেই রাজনীতির প্রেক্ষাপট

চিত্রায়ণ এত বেশি পক্ষপাতদুষ্ট যে নিরপেক্ষ মূল্যায়ন দুরূহ। এ ছাড়া জিন্না তাঁর রাজনৈতিক জীবনস্রোতের অভিমুখ বার বার পালটেছেন, হয়তো সে কারণেই তাঁর বহু উক্তির পূর্বাপর সামঞ্জস্যহীনতা তাঁকে আরও বিতর্কিত করে তুলেছে।

ভারতে স্কুল-কলেজগুলিতে জিন্না সম্পর্কে হয় উপেক্ষার নীরবতা গ্রহণ করা হয় নয়তো বা তাঁকে ক্ষমতালিপ্সু সাম্প্রদায়িক হিসেবে চিত্রিত করা হয়। প্রকৃতপক্ষে জিন্না ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতায় বিশ্বাস করতেন কিনা এই প্রশ্নের উত্তর 'হ্যাঁ' এবং 'না' দুটোই হতে পারে, অথবা দুটোর একটাও হতে পারে। গবেষকরা নানা ভাবেই তাঁকে চিত্রিত করেছেন। আমি যেটুকু তাঁকে বুঝেছি তাতে আমার মনে হয়েছে, তিনি ব্যক্তি-জীবনে সম্পূর্ণ ধর্ম-উদাসীন কিন্তু ধর্মকে তিনি রাজনীতির বর্ম হিসেবে ব্যবহার করতে কুণ্ঠা বোধ করেননি — বিশেষ করে জীবনের দ্বিতীয় পর্যায়ে।

আমি নিজে জন্মেছি পূর্ব পাকিস্তানে এবং দাঙ্গাক্লিষ্ট বাস্তুহারা মায়ের কোলে কয়েকমাস বয়সে শরণার্থী হয়ে পশ্চিমবঙ্গে এসেছিলাম। আমার পিতা স্বাধীনতা সংগ্রামী এবং আদর্শ শিক্ষক। আমি তাঁর মতো সম্পূর্ণ ধর্মীয় সংস্কারমুক্ত, সহনশীল, সত্যনিষ্ঠ, নীতিনির্ভর মানুষ জীবনে দেখিনি। তাঁর কাছ থেকেই আমি ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের শেষ দশকের ভয়ংকর দিনগুলি সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ, প্রত্যক্ষ-অভিজ্ঞতা-সমৃদ্ধ তথ্যের সন্ধান পাই। তিনি আমাকে ঐতিহাসিক নানা ঘটনাবলির পশ্চাৎ কাহিনি বুঝতে সাহায্য করেন।

জিন্না যে ইতিহাসের গতিপথকে পালটাতে পেরেছিলেন তা অস্বীকার করার উপায় নেই। ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রখ্যাত অধ্যাপক স্ট্যানলি উলপার্ট জিন্না সম্পর্কে বলেছেন :

'Few individuals significantly alter the course of

history. Fewer still modify the map of the world. Hardly anyone can be credited with creating a nation-state. Mohammad Ali Jinnah did all three.'

এমন একজন মানুষ যে উপেক্ষণীয় নন তা স্পষ্ট। সম্প্রতি ভারতীয় জনতা পার্টির সভাপতি শ্রী লালকৃষ্ণ আদবানি জিন্নার ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গির প্রশংসা করায় আগুনে ঘি ঢালার মতো চতুর্দিকে সমালোচনার ঢেউ উঠেছে। লক্ষ করলে দেখা যাবে যাঁরা আদবানিকে সমর্থন বা বিরোধিতা করেছেন তাঁদের মধ্যে অনেকেই খণ্ডিত চিন্তার আলোকে জিন্নাকে দেখেছেন। পুনশ্চ প্রকাশনীর কর্ণধার অগ্রজপ্রতিম শ্রী শঙ্করীভূষণ নায়ক আমাকে সম্পূর্ণ ইতিহাসের দৃষ্টিকোণ থেকে জিন্না সম্পর্কে নিরপেক্ষভাবে লিখতে অনুরোধ করেন এবং সেই সঙ্গে প্রয়োজনীয় সবরকমের তথ্য সংগ্রহের জন্য উৎসাহ দেন।

ভারতের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে আমার কিছু রচনা ইংরেজিতে পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়। সেই কাজের প্রয়োজনে আমার সংগৃহীত কিছু তথ্য ভাণ্ডার ছিল। শঙ্করীদার উৎসাহ পেয়ে আমি নতুন করে আরও নানা তথ্য সংগ্রহ করি। রাজনীতিক জিন্নার পাশাপাশি মানুষ জিন্নাকে খুঁজে পেতে চেষ্টা করি। আমার পিতৃদেবের পূজনীয় অধ্যাপক শ্রী পি আর চক্রবর্তী, তিনি বরিশাল বি এম কলেজের অধ্যাপক ছিলেন এবং পরবর্তীকালে ভারতের সাংসদ ও এ আই সি সি-র সম্পাদক ও রাষ্ট্রসংঘের ভারতীয় প্রতিনিধি ছিলেন। তাঁর লেখা কয়েকটি প্রবন্ধের একটি ফাইল তাঁর সুযোগ্য ছাত্র শ্রী তপন চট্টোপাধ্যায়ের হাত থেকে আমি পাই। সেই ফাইলে তাঁর অনেক অপ্রকাশিত লেখা রয়েছে যেগুলি স্বাধীনতার কয়েক বছর আগের থেকে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক পরিস্থিতি বুঝতে সহায়ক। আমার পিতৃদেবের স্বর্গীয় অধ্যাপকের স্মৃতির উদ্দেশে প্রণাম জানিয়ে আমি ঋণ স্বীকার করে তাঁর প্রবন্ধ থেকেও তথ্য ব্যবহার করেছি।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের এক জটিল পরিস্থিতিতে, জিন্নার কর্মধারা ও স্বাধীনতা আন্দোলন ওতপ্রোতভাবে জড়িত, তাই জিন্নার জীবনকথায় সেই সময়কাল তার সমস্ত বাস্তবতা নিয়ে উঠে এসেছে। আমি সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে ব্যক্তি জিন্না এবং তাঁর জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত সময়কে তুলে ধরবার চেষ্টা করলাম। বইটির আকার ছোটো, তাই সব তথ্য পরিবেশন করা সম্ভব হল না।

বইটি যদি জিন্না এবং আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস সম্পর্কে পাঠকের আগ্রহকে উদ্দীপিত করতে পারে তবে আমার শ্রম সার্থক হয়েছে বলে মনে করব।

স্বপন মুখোপাধ্যায়

বইমেলা, ২০০৬
শ্রীবর্ধন পল্লি
বাখরাহাট রোড
পো: জোকা
কলকাতা-৭০০ ১০৪

সূচিপত্র

প্রাক্-কথন	১৩
জিন্নার জন্ম	১৭
কংগ্রেসের নেতা জিন্না	২৪
হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের দূত জিন্না	৩৭
জিন্নার নতুন পারিবারিক জীবন	৪৬
ভারতীয় রাজনীতিতে গান্ধি-জিন্না দ্বৈরথ	৫৭
রাজনীতিতে নতুন সাজে জিন্না	৬৭
গোলটেবিল বৈঠকে জিন্না	৮৬
জিন্নার পাকিস্তান দাবি	৯৩
জিন্নার সাম্প্রদায়িক হাতিয়ার	১০৬
পাকিস্তান চাই-ই — জিন্না	১২১
জিন্নার প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ডাক — ভারত জুড়ে দাঙ্গা	১৩২
অন্তর্বর্তী সরকার	১৩৬
ভারত ভাগ	১৪৪
পাকিস্তানে পা দিলেন জিন্না	১৫৩
জিন্নার জীবনে মৃত্যুর ছায়া	১৬২
ঘটনাপঞ্জি	১৬৭

প্রাক্-কথন

একদিকে সরু খাল আরেকদিকে শস্যশূন্য খেত, মাঝখান দিয়ে সিঁথির মতো হাঁটা পথ। পথ চলেছে পশ্চিমমুখে। সেই পথ ধরে হেঁটে চলেছে পিঁপড়ের মতো মানুষের সারি। মহিলা, পুরুষ, বালক, বালিকা, বৃদ্ধ, বৃদ্ধা। তারা হাঁটছে, মুখে কোনো কথা নেই। বিষণ্ন চোখে-মুখে আতঙ্ক পথশ্রমের ক্লান্তিকেও ছাপিয়ে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। পশ্চিমে ঢলে পড়া সূর্যের পড়ন্ত রোদের সোনালি আভা হালকা মেঘের আস্তরণ ভেদ করে তাদের মুখের ওপর এসে পড়ছে। পুবে মানুষের দীর্ঘ ছায়া খালের জলে তিরতির করে কাঁপছে। অনেকটা পিছিয়ে পড়েছে এক বৃদ্ধা আর তার ষোড়শী নাতনি। মেয়েটির একটি হাত কাপড়ের পুঁটলিটাকে মাথার ওপর সামলে রাখে, আরেক হাত বৃদ্ধা ঠাকুমার হাতে। এই বৃদ্ধার দুর্বল হাতখানিই তার একমাত্র আশ্রয়। কোথায় যাচ্ছে জানে না। শুধু জানে যেখানে যাচ্ছে সেখানে মরার ভয় নেই। মুসলমান বলে কোনো আতঙ্কের কারণ নেই। সেখানে কাকা

আসবেন তাদের খোঁজে। তেমনটি বলা আছে। লাহোর শহর এখান থেকে অনেক দূর, তবে সামনেই স্কুলবাড়ির শরণার্থী শিবিরে পৌঁছোতে পারলে আর ভয় নেই।

দুটি যুবক এগিয়ে যাওয়া লাইন থেকে ছুটতে ছুটতে তাদের দিকে আসছে। এদের চেনে মেয়েটি। এরা ভলান্টিয়ার। তাদের দলটিকে নিরাপদে শরণার্থী শিবিরে নিয়ে যাওয়ার ভার এই ছেলেদুটির ওপর। বড়ো ভালো ছেলে। ছোটোটির নাম ইয়াকুব। সে বারবার এসে খবর নেয়, কিছু প্রয়োজন আছে কিনা। ইয়াকুব এসে জানাল, 'আস্তে আস্তে আসুন, কোনো ভয় নেই। আমরা প্রায় এসে গেছি, ওই বড়ো রাস্তাটা পেরলেই যে মসজিদটা দেখতে পাচ্ছেন তার পেছনেই স্কুল বাড়ি, ওখানে একবার পৌঁছতে পারলে আর কোনো চিন্তা নেই।"

বৃদ্ধা দাঁড়িয়ে পড়েছে। চোখের সামনে ছেলেকে কুপিয়ে মেরেছে তবু বৃদ্ধার মরণ হয়নি। বাপমরা মেয়েটাকে বাঁচাতে বর্ডার পেরিয়ে হিন্দুস্থান থেকে পাকিস্তানে। দূরে মসজিদ থেকে কাঁপা কাঁপা করুণ সুরে কে যেন নামাজ পড়ার জন্য আহ্বান জানাচ্ছে। সেদিকে তাকিয়ে বৃদ্ধার দু-চোখ দিয়ে জলের ধারা নেমে এসেছে।

— আল্লা! আর তো পারি না। আমায় কেন তুমি বাঁচিয়ে রাখলে, আল্লা! মরিয়ম আমি একটু বসি বিটি!

মরিয়ম বৃদ্ধার নাতনি। সে পুঁটলি খুলে একটা ঢাকনা-দেওয়া কাঁসার ঘটি থেকে জল নিয়ে বৃদ্ধার চোখে মুখে ছিটিয়ে দেয়, গলাতেও ঢেলে দেয় দু-ঢোক জল। ইয়াকুবও দাঁড়িয়ে পড়েছে। সে যেন দেবদূতের মতো সঙ্গে সঙ্গে আছে। সে নিশ্চিন্ত করে — 'ভয় নেই, একটু জিরিয়ে নিন। এই তো এসে গেছি।'

শরণার্থী শিবিরে যখন বৃদ্ধা মরিয়মের হাত ধরে ঢুকছে তখন সেখানে চরম ব্যস্ততা। সারে সারে গাড়ি, পুলিশ। চিৎকার, চেঁচামেচি।

আতঙ্কিত মুখে চারদিকে তাকিয়ে মরিয়ম কিছুই বুঝতে পারে না। এক ফাঁকে ইয়াকুব এসে বলে গেল — কায়েদ-ই-আজম জিন্না সাহেব শিবির দেখতে এসেছেন, তাই অত ব্যস্ততা।

গেটের মুখেই মরিয়মের সামনে এসে দাঁড়াল একটি মোটর গাড়ি। গাড়ি থেকে নেমে এলেন রোগা ছিপছিপে গম্ভীর মুখের একজন মানুষ। হ্যাঁ, মরিয়ম ওনাকে চেনে। ইনিই তো জিন্না সাহেব। ওঁর ছবি দেখেছে মরিয়ম। জিন্না সাহেব চুপ করে তাকিয়ে আছেন মরিয়মের দিকে। একদৃষ্টে দেখছেন মরিয়মকে, আর যেন কাকে খুঁজছেন। জিন্না সাহেব সস্নেহে মরিয়মের মাথায় হাত বুলিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কোথা থেকে আসছ?

— আটারি।

— তোমার নাম কী ?

— মরিয়ম।

জিন্না সাহেবের পিঠের ওপর কেউ যেন একটা চাবুক মারল। তাঁর হাত কাঁপছে। কী নাম বললে?

— মরিয়ম।

পাশের থেকে কে একজন বলল, স্যার ওর বাবাকে দাঙ্গাবাজরা কেটে ফেলেছে, ঠাকুমার সঙ্গে চলে এসেছে আমাদের শিবিরে।

জিন্নার কাছে এ কোনো নতুন সংবাদ নয়, অপ্রত্যাশিতও নয়। সহজে জিন্না কোনো কিছুতে আবেগে অভিভূত হন না। বাইরের কেউ তাঁর অন্তরের খবর সহজে জানতে পারে না। কিন্তু আজ মোটরের মধ্য থেকেই মেয়েটির মুখ দেখে চমকে উঠেছিলেন জিন্না। এতো তাঁর বড়ো আদরের রতন বাঈ। আজ থেকে একত্রিশ বছর আগে রতনকে যেমন দেখেছিলেন জিন্না, ঠিক সেই মুখ, সেই চেহারা। বড়ো করুণ, কিন্তু বড়ো সুন্দর মিষ্টি। রতনকে বিয়ে করে তার নাম দিয়েছিলেন মরিয়ম। আশ্চর্য এই কি সেই মরিয়ম। প্রতিশোধ নিতে এসেছে। সেও তো আঠারো বছর আগে কবরে নিশ্চিন্তে ঘুমোতে

চলে গেছে। কিন্তু জিন্নার ওপর বড়ো অভিমান করে, হয়তো অভিসম্পাত দিয়ে চলে গেছে। জিন্নার চোখের কোণে কত বছর পর যেন এক ফোঁটা জল টলটল করতে লাগল। কে বলে জিন্না কাঁদতে জানেন না?

জীবনে যা চেয়েছেন তা আদায় করে ছেড়েছেন। কোনো বাধাকে গ্রাহ্য করেননি। এভাবেই একদিন রতি তাঁর জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে গিয়েছিল। পাকিস্তান চেয়েছিলেন। পেয়েছেন। কিন্তু রতি, মরিয়ম তারা কি তাঁকে অভিশাপ দিচ্ছে? তাহলে ওই যে ধ্বনি উঠছে — পাকিস্তান জিন্দাবাদ! কায়েদ-ই-আজম জিন্দাবাদ! ১৯৪৭-এর আগস্ট মাস। ঘুমোতে পারেন না জিন্না। বুকের কাশির দমকে চোখ-মুখ দিয়ে যেন আগুন বেরুচ্ছে। মাঝরাতে উঠে বসে থাকেন। তাঁর স্বপ্নের দেশ পাকিস্তানে শুয়ে আছেন জিন্না। কিন্তু ঘুম আসে না। বুকের যন্ত্রণা যেমন অসহ্য তেমনি প্রতিদিনের ভয়ংকর দাঙ্গার খবর। হাজার হাজার নিরীহ মানুষের প্রাণ অকারণে নষ্ট হচ্ছে, সেই সঙ্গে লক্ষ লক্ষ গৃহহারা মানুষের অবর্ণনীয় কষ্ট। এই পাকিস্তান কি চেয়েছিলেন তিনি? দাঙ্গা, রক্তপাত, জাতিদ্বন্দ্ব, মৃত্যু, আগুন-এর কোনোটাই তাঁর কাছে অপ্রত্যাশিত নয়। তবে কতটা যন্ত্রণা সহ্য করার ক্ষমতা থাকলে তবে তিনি আজ একটু ঘুমোতে পারেন! অথচ ঘুমোনো দরকার, কালই ফিরে যেতে হবে করাচি। একটা দেশ, একটা জাতি তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে আগুনে ঝাঁপ দিয়েছে। কিন্তু তিনি নিজে বড়ো নিঃসঙ্গ।

জিন্নার মনে পড়ল ওয়াটারলুর যুদ্ধের পর ডিউক অব ওয়েলিংটন বলেছিলেন, যুদ্ধে সব থেকে খারাপ, হেরে যাওয়া, তারপরই যেটা খারাপ, সেটা জিতে যাওয়া। আজ জিন্নার জয়। পাকিস্তানের দাবি আদায় করে তিনি জয়ী। কিন্তু পাকিস্তান কীটদষ্ট, দু-টুকরো। সত্যি কি এই পাকিস্তান তিনি চেয়েছিলেন?

জিন্নার জন্ম

আরবিতে জিন্না শব্দের অর্থ ডানা — পাখির ডানা অথবা কোনো সেনাদলের একটি অঙ্গ, যাকে ইংরেজিতে উইং বলা হয়। জিন্না ছিলেন সিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত খোজা শ্রেণির মুসলমান। এই সম্প্রদায়ের বহু মুসলমান হাজার বছর আগে ইরান থেকে পালিয়ে পশ্চিম ভারতে আশ্রয় নেয়। সেই থেকে তারা ভারতে। কিন্তু এই সম্প্রদায়ের মুসলমানরা তো শাসন করতে বা শোষণ করতে ভারতে আসেনি, এসেছে আশ্রয়প্রার্থী হয়ে তাই তাদের সঙ্গে হিন্দুদের বেশ ভাব বিনিময় হয়। এরা হিন্দুদের অনেক প্রাচীন ধর্মীয় পুরাকথাকে বিশ্বাস করে, মানে এবং শ্রদ্ধা করে। সোজা কথায় এদের সঙ্গে হিন্দুদের বিরোধ নয়, সদ্‌ভাব গড়ে ওঠে। একই কারণে গোঁড়া মুসলমানরা আবার এদের মুসলমান বলেই মানতে চান না। খোজারা আগাখানকে তাদের ধর্মগুরু বলে মানেন। বণিক হিসেবে খোজাদের খুব খ্যাতি। এরা বুদ্ধিমান ও কর্মোদ্যোগী। জিন্নার পূর্বপুরুষরা একসময় থাকতেন গুজরাটে। জিন্নার বাবা (১৮০৫-এ জন্মগ্রহণ করেন) জিন্নাভাই পুঞ্জা